তারিখ 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

কালের কণ্ঠ

শিক্ষাই গড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আর এই প্রজন্মই আগামীতে নেবে রাষ্ট্র, ব্যবসা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্ব। কিন্তু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কী শিখছে আমাদের সন্তানরা? শিক্ষার মূল লক্ষ্য যখন হয়ে দাঁড়ায় অর্থ আয়ের ধান্দা, বাড়ে মেধাহীনদের রাজত্ব, চলে দুর্নীতির গ্রাস, তখন সেখানে ধস নামতে বাধ্য। দিনে দিনে দেশের শিক্ষার মান নিম্নগামী। ফলে সবার অজান্তে গড়ে উঠছে আধাশিক্ষিত এক প্রজন্ম, যা পুরো জাতির জন্য এক অশনিসংকেত

শিক্ষার মানে ধস মাধ্যমিক থেকে

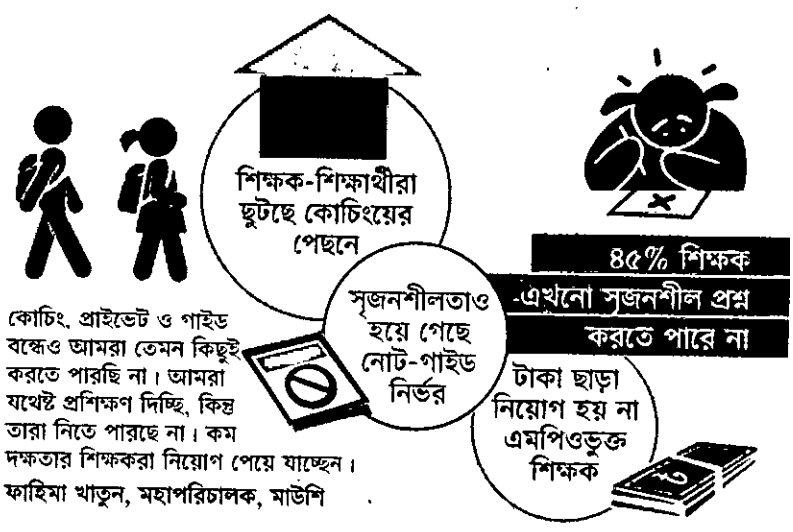

শরীফুল আলম সুমন ▷

ফুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার ফুলতলা গ্রামে গড়ে ওঠা একটি মাধ্যমিক স্কুল। এককালে পুরো উপজেলা তো বটেই, এমনকি জেলাজুড়ে সুনাম ছড়ানো এই স্কুল পরিচালনায় এখন যে ম্যানেজিং কমিটি আছে তার কোনো সদস্যই এসএসসির গণ্ডি পেরুতে পারেননি। তাঁদের কেউ কৃষি শ্রমিক, গার্মেন্টি শ্রমিক, কেউ বা মুদি দোকানি অথবা গৃহিণী। স্কুলের পরিবেশ উন্নয়ন বা শিক্ষার মান বাড়ানোর পরিকল্পনা তাঁদের ভাবনায় আসার কথা নয় খুব স্বাভাবিক কারণেই। তবু প্রভাব খাটিয়ে তাঁরা পদগুলো অলংকৃত করছেন বৈষয়িক ধান্দায়। শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে যদি কিছু আয়-রোজগার হয়—এই হলো লক্ষ্য। স্কুল পরিচালনা কমিটির এই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কৃষি শ্রমিক শরীফ আবার পদ ছেড়ে স্কুলের দপ্তরির চাকরি নিয়েছেন। আগের মেয়াদে থাকা কমিটি টাকার বিনিময়ে এমন এক কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে, যিনি যন্ত্রটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা-ই জানেন না। গত কয়েক বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সবাইকে কম-বেশি টাকা দিয়ে চাকরি নিতে হয়েছে। তবে টাকার অঙ্কের চেয়ে নিয়োগে স্বজনপ্রীতিই কাজ করেছে বেশি। অবসরে যাওয়ার আগে সাবেক প্রধান শিক্ষক তাঁর ভাতিজাকে, আরেক সাবেক সিনিয়র শিক্ষক তাঁর ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন। বাকি চারজনের দুজন ওই গ্রামেরই বউ। বাকি দুজনের আত্মীয় রয়েছে ওই গ্রামে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ বড় একটি বাংলা শব্দ সাধারণ গতিতে উচ্চারণ করতে পারেন না বলে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করে। স্কুলটির ধর্ম শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সল্লা গ্রামের এক প্রার্থীর কাছ থেকে ছয় লাখ টাকা ঘুষ নেন তখনকার স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ কয়েকজন সদস্য। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন কমিটি আর তাঁকে নিয়োগ দেয়নি। অভিযোগ রয়েছে, আগের কমিটির সভাপতি সংগ্রাম মিয়া ওই টাকা মেরে দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। এ প্রতিবেদক কয়েকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

কেবল শিক্ষা-দীক্ষায়ই নয়, অর্থের মায়ায় যুগ যুগ ধরে দেশপ্রেমও ভুলে ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তান আমলে স্থাপিত স্কুলটির এক চৌচালা ভবনের চালের কোণে একখণ্ড টিন কেটে নকশা করে লেখা হয়েছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওই লেখাটি সরাতে শিক্ষকদের বহুবার অনুরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ১০০ টাকা খরচ হবে—এ চিন্তায় তা করা হয়নি। পরে উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে বছর তিনেক আগে সেখানে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' লেখাযুক্ত একখণ্ড টিন লাগানো হয়েছে।

এসব বিষয়ে ফুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজ জানান, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যরা যদি পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণি পাস হন, সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁরা ভালোর চেয়ে মন্দই করেন বেশি। আর ক্লাসে শিক্ষার্থী ধরে রাখতে শিক্ষকদের তেমন কিছু করার নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর দায় অভিভাবকদের নিতে হবে।

এই স্কুলটির মতোই চলছে দেশের বেশির ভাগ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষক নিয়োগ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

শিক্ষার মানে ধস মাধ্যমিক থেকে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগেই সম্ভাব্য প্রার্থীর কাছ থেকে পাঁচ-সাত লাখ টাকা করে ঘুষ নিয়ে নেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় রাজনীতিক, উপজেলা চেয়ারম্যান, এমনকি সংসদ সদস্যরাও। তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে মেধাবীদের চাকরি দিতে আগ্রহী নন। বরং আগে থেকে ঠিক করা প্রার্থীকে পরীক্ষার আগের দিন লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন দিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার সুযোগ করে দেন। ফলে সহজেই কাগজে-কলমে পরীক্ষার ফলাফলে 'শ্রেষ্ঠ' অধম প্রার্থীরাই শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসাগুলোতে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, দেশে এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এর বাইরেও আরো ১০ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে এক কোটি ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী। সরকার ব্যস্ত তাদের সাড়ে ৬০০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৫ লাখ শিক্ষার্থী নিয়ে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নে তাদের কোনো গরজ নেই। পুরো দায়িত্বই পরিচালনা কমিটির হাতে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে দেদারছে টাকার বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, শিক্ষার চার স্তরের মধ্যে মাধ্যমিকের অবস্থাই সবচেয়ে দুর্বল। এ স্তরের শিক্ষকদের বেশির ভাগ অযোগ্য ও অদক্ষ। তাঁদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যায় না। পাসের হার বাড়লেই মান বেড়েছে, সে দাবি ঠিক নয়। কারণ একটা সিস্টেমের মধ্যে কিছু জিনিস পড়লেই জিপিএ ৫ পাওয়া যায়। মান বাড়ার সঙ্গে পাঠ্যসূচির বাইরের জ্ঞান, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, মূল্যবোধসহ বিভিন্ন ব্যাপার জড়িত। তাই সত্যিকার অর্থে যেভাবে মান বাড়া উচিত সেভাবে বাড়ছে না।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার গড়পড়তা মান বাড়ছে না। পারিবারিকভাবে সামর্থ্যবানরা কিছু শিখছে। কিন্তু বেশির ভাগেরই তো সেই সামর্থ্য নেই, তাই তারা তেমন কিছুই শিখছে না। আমাদের শিক্ষকদের গুণগত মান নেই। তাঁরা ক্লাসরুমবহির্ভূত কাজে ব্যস্ত। আসলে মান বৃদ্ধিকে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরাও গুরুত্ব দেন না। তাঁরা দেখেন জিপিএ কত এলো। শিক্ষার্থীরা কতটা শিখছে তা জানতে চান না। তাই শিক্ষার্থীরাও শুধু নম্বর পাওয়ার কৌশল রপ্ত করছে। মাধ্যমিকে সৃজনশীল পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য নয়। আগে পুরো বই পড়তে হলেও এখন তার দরকার হয় না। শিক্ষকরাও জানে না কিভাবে সৃজনশীল পড়াতে হয়।'

গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তির জন্য মাত্র দুজন উত্তীর্ণ হয়। অথচ ওই বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৭০ হাজার ৬০২ জন। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েও ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষাবিদরা তখন শিক্ষার মান নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাসের হার বাড়লেও মান সেভাবে বাড়ছে না। এ জন্যই ক্লাসের পড়ার বাইরে শিক্ষার্থীরা তেমন কিছুই জানে না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা—এই চার স্তরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে মাধ্যমিক স্তর। কারণ এই স্তরেই শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠার সময়। অথচ এ পর্বের শিক্ষকরাই বেশি অদক্ষ। এই স্তরের বেশির ভাগ স্কুলই এমপিওভুক্ত। আর এমপিওভুক্ত শিক্ষক হতে গেলে দক্ষতা নয়, প্রয়োজন হয় টাকার। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণব্যবস্থাও তেমন জোরালো নয়। সরকার এই স্তরকে ঢেলে সাজাতে ২০০৮ সাল থেকে চালু করে সৃজনশীল পদ্ধতি। কিন্তু সেই সৃজনশীল এখন হয়ে গেছে নোট-গাইডনির্ভর। শিক্ষকরা এখনো পারেন না সৃজনশীল প্রশ্ন করতে। তাঁরা ক্লাসের চেয়ে কোচিংয়ে পড়াতেই বেশি পছন্দ করছেন। তাই পড়ালেখায় মন না দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছুটতে হচ্ছে এক শিক্ষকের কাছ থেকে আরেক শিক্ষকের কাছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই চলছে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে টাকা ছাড়া কোনো শিক্ষকই নিয়োগ পান না। কত টাকা দিতে হবে, তাও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি নির্ধারণ করে দেয়। যোগ্য প্রার্থীরা টাকা না দিতে পারলে নানা কৌশলে নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়। পরিচালনা কমিটির ওপর শিক্ষা প্রশাসনের তদারকি না থাকায় তারা ইচ্ছামতো চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠান। মানের দিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই।

খোদ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক গবেষণায়ও উঠে এসেছে মাধ্যমিক শিক্ষার ভয়াবহ চিত্র। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান যাচাই করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের গত নভেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ গবেষণায় বলা হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্র ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত মানের দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। বাকি ১৮ শতাংশ অদক্ষ, ৪২ শতাংশ আধাদক্ষ ও ৩২ শতাংশ মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। আর অষ্টম শ্রেণির ইংরেজিতে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই ৬৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর। এ ছাড়া গত বছর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায়, ৫৬ শতাংশ ইংরেজিতে ও ৬৫ শতাংশ গণিতে নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। এমনকি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১৩ সালের গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রতিবেদনে বলছে, বাংলাদেশে গণিত শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক গড় স্তরের নিচে। ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩তম।

গত বছর প্রকাশিত মাউশির একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঢাকা অঞ্চলে প্রায় ৫৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সৃজনশীলে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। ৩৭ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে। রংপুর অঞ্চলেও প্রায় এই একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট। ওই অঞ্চলের ৩৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রশ্ন নিজেরা করতে পারে। ৪৭ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন আংশিক নিজেরা করে আর ১৪ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন কিনে নেয়। এভাবে সব অঞ্চল মিলিয়ে মাত্র ৫৫ শতাংশ বিদ্যালয় পরীক্ষার সব বিষয়ের প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। যদিও মাঠপর্যায়ের চিত্র আরো করুণ।

জানতে চাইলে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হতে হবে—এ কথাটা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি। কোচিং, প্রাইভেট ও গাইড বন্ধেও আমরা তেমন কিছুই করতে পারছি না। মনে হয় যেন ধরাবাঁধা নিয়ম, তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসে। আসলে তাদের আগ্রহ নিয়েই আসতে হবে। শিক্ষকদেরও সচেতন হতে হবে। আমরা যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, কিন্তু তাঁরা নিতে পারছেন না। আর এমপিওভুক্ত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দেয় পরিচালনা কমিটি। সেখানে কম দক্ষতার শিক্ষকরা নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন। সরকারি স্কুলেও শিক্ষক সংকট চলছে।'

মাউশির প্রশিক্ষণ শাখা সূত্র জানায়, এরই মধ্যে মাধ্যমিকের ২৩টি বিষয়ে প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে কারিকুলামের ওপর দুই হাজার ১৬ জন মাস্টার ট্রেইনার ও ৭০ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চলছে। এ ছাড়া লাইফ স্কিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চলছে। গড়ে প্রতিবছর ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। কিন্তু শিক্ষকরা বলছেন ভিন্ন কথা। বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ ৬০ হাজার। সরকারি স্কুলে এ সংখ্যা প্রায় আট হাজার ৫০০। আর এমপিওভুক্ত হয়নি অথচ মাধ্যমিকে পড়ান এমন শিক্ষকের সংখ্যা লক্ষাধিকের কাছাকাছি। ফলে সৃজনশীল বিষয়ে সাড়ে চার লাখ জন প্রশিক্ষণ পেলেও শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশি। বেশির ভাগ শিক্ষকই সৃজনশীল বিষয়ে একবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তিন বা সাত দিনের। এতে একজন শিক্ষকের পক্ষে কতটুকু সৃজনশীলতা আয়ত্ত করা সম্ভব সে প্রশ্ন শিক্ষকদেরই। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান বলেন, 'মাধ্যমিক পর্যায়ে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের অনেকেরই শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাঁরা প্রশিক্ষণ ধারণ করতে পারেন না। যেসব শিক্ষক নিজেরাই ভালো বুঝতে পারেন না, তাঁরা শিক্ষার্থীদের কী পড়াচ্ছেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল সময়ের আগে বা পরে কোচিং করানো যাবে। তবে কোনোভাবেই জোর করা যাবে না। এ জন্য মেট্রোপলিটন শহরের জন্য বিষয়প্রতি ৩০০, জেলা শহরে ২০০ ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টাকা গ্রহণ করা যাবে। প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোনো শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাইরের কোনো কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু এই নীতিমালার কোনোটিই মানছে না বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো না পড়িয়ে ছুটছেন কোচিং ও প্রাইভেটের পেছনে।

সম্প্রতি মিরপুরের মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার অজুহাতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে কোচিং বাধ্যতামূলক করেছে। অভিভাবকরা এর বিপক্ষে জোরালো অবস্থান নিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অনড়। এই দুই শ্রেণির কোচিং থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের আয় হবে অতিরিক্ত ৭০ লাখ টাকা। অথচ প্রত্যেক শিক্ষার্থীই স্কুলের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে একাধিক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ছে। ফলে একজন শিক্ষার্থীকে দুপুর পর্যন্ত ক্লাস করার পর কোচিং করতে হচ্ছে আরো দুই থেকে তিন ঘণ্টা। এরপর বাসায় গিয়ে বিকেলে ও রাতে আবার প্রাইভেট। এতে চাপ বাড়ছে তাদের ওপর।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন হচ্ছে না। মাধ্যমিকের বিদ্যালয়গুলো সবই বেসরকারি। এখানের নিয়োগ পুরোটাই ত্রুটিপূর্ণ। অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। নিয়োগে দলীয়, আঞ্চলিকতার প্রভাব প্রকট। পড়ালেখার পুরোটাই টিউশনি ও কোচিংনির্ভর। স্কুলে পড়ালেখা হয় খুবই কম। আর যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেন, তাঁদের মানও যথেষ্ট কি না সেটাও দেখা উচিত। তাই সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় আছে মাধ্যমিকই।'

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১২৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)। এরপর আবার ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫টি উপজেলায় তিন হাজার ৪০০ কোটি টাকার [illegible] নিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে সেকায়েপ। কিন্তু এই প্রকল্প শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে দুর্নীতির জন্যই বেশি আলোচিত। প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ এনে ২০ কর্মকর্তার ১৬ জনই অনাস্থা প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে নতুন একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।